Jagannath University Journal of Arts, Vol. 9, No. 1, January-June 2019
ISSN 2519-5816

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হল সমাচার: মুসলিম হল প্রসঙ্গ (১৯২১-১৯৪৭)

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন*

Abstract: After the annulment of the partition of Bengal in 1911, following the demands from Nawab Sir Khwaja Salimullah Bahadur and others, Viceroy Lord Hardinge proposed on February 2, 1912 that a new university should be established in this partition of Bengal. In 1913 public opinion was solicited before the university scheme was given its final shape, and the Secretary of the State approved it in December 1913. According to the reports of Nathan Commission and Calcutta University Commission Dhaka University was established in 1921, under the Dacca University Act of 1920 in the Indian Legislative Council. However, Philip Joseph Hartog was appointed its first vice-chancellor. Academic activities started on July 1, 1921 with three faculties: Arts, Science and Law alongwith 12 departments.Kolkata University Commission also proposed a unique Hall for the Muslim students of Dhaka University and accordingly Jagannath Hall for non-Muslim, Dhaka Hall for all other religion students and Muslim Hall with some rooms of 2nd floor of secretariat Building (present Dhaka Medical College) for Muslims were established in 1 January 1921. In this article the initiative has taken to explore the role and contribution of the Muslim Halls to the socio-cultural and political pursuit and to determine its position in the history of Bengal.

ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিউট প্রাচীন প্যারিস মডেল (অর্থাৎOxford-Cambridge) এবং আধুনিক প্যারিস মডেলের (ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়) এক অনন্য সংমিশ্রণ; বিধায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত। বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতোমধ্যে ৯৮ বছর অতিক্রম করেছে এবং এর সুদীর্ঘ ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবের। বাঙালি জাতির ইতিহাসের সাক্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস মানেই বাঙালি জাতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে পূর্ব বঙ্গের অধিকাংশ জনগোষ্ঠিই ছিল শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চেতনায় অবহেলিত ও পশ্চাতপদ। বাঙালি মুসলমান সমাজের আরেক মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা ছিল ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতা-যা মুসলমারদেরকে আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দেয়।এ রকম পটভূমিকায় ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পূর্ববঙ্গের মানুষের বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির সংগ্রামে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। উল্লেখ্য ১৯২০ সালের ১৩ মার্চ ভারতীয় আইন সভায় 'দিঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট (অ্যাক্ট নং-

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৩) ১৯২০' পাশ হয়। ২৩ মার্চ ১৯২০ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড রিডিং তাতে সম্মতি প্রদান করেন। ঐ আইনের দ্বারাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি একাডেমিক অ্যান্ড রেসিডেন্সিয়্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। তিনটি হল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়, যার একটির নামকরণ করা হয় 'মুসলিম হল'; যা পরবর্তী সময়ে ১৯২৮ সালে সংশোধিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের দ্বারা নামকরণ করা হয়'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল'। ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে যার নাম সর্বজনবিদিত। আলোচ্য প্রবন্ধে মুসলিম হলের মুসলিম ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পূর্ববঙ্গে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকাশে ভূমিকা রেখেছে তা অন্বেষণে প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রস্তাবিত প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণে লিখিত। প্রবন্ধ রচনায় প্রাথমিক ও গৌণ উভয় উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ডস্ রুম, ডাকসু সংগ্রহশালা, বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমাবর্তন বক্তৃতা, সমাবর্তন সুভ্যেনির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বার্ষিক রিপোর্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নথিপত্র, সমসাময়িক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা, ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা রিভিউ ইত্যাদি থেকে সংগৃহিত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এসব সূত্র ও তথ্য প্রবন্ধ রচনায় সহায়ক হয়েছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থাদির সহায়তা নেয়া হয়েছে। M A Rahim (1981), *The History of the University of Dacc,;* Sufia Ahmed (1974), *Muslim Community of Bengal (1884-1912)*; সৈয়দ রেজাউর রহমান (২০০১), *গৌরবোজ্জ্বল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*; মোহাম্মদ হান্নান (১৯৯৪), *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*; রংগলাল সেন ও অন্যান্য সম্পাদিত (২০০৯), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান*; রফিকুল ইসলাম (২০১২), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছর*; সৈয়দ আবুল মকসুদ (২০১৬), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা*; মোঃ আলমগীর (২০১৪), *মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়ন এবং জীবন গঠনে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উপরন্তু বিভিন্ন জার্নাল, স্মরণিকা, সমসাময়িক ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের স্মৃতিকথা, অভিজ্ঞতা ও লেখনি থেকেও তথ্য সংগৃহিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই মুসলিম হল প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সাথে মুসলিম হলের ইতিহাসও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোন গবেষণা এখন পর্যন্ত হয়নি। মুসলিম হলের ছাত্ররাই মূলত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যার পরিণতি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা। হল প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকেই মুসলিম ছাত্রদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড কিভাবে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ বিকাশে সহায়ক হয়েছিল আলোচ্য প্রবন্ধে তা তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বংলাকে বিভক্ত করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও আসামের সমন্বয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়।[১] ঢাকা হয় নতুন প্রদেশের রাজধানী। কিন্তু ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গবিভাগ রদের ঘোষণা দেন।[২] এই ঘোষণায় পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ এই ছয় বছর

পূর্ববঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষকরে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সাফল্য ঈর্ষাণীয়। ১৯০৬ সালে পূর্ববাংলায় কলেজ ছাত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ১,৬৯৮ জন এবং খরচ ১,৫৪,৩৫৮ টাকা যা বেড়ে ১৯১২ সালে দাঁড়ায় ২,৫৬০ জন এবং খরচ ৩,৮৩,৬১৯ টাকা। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে নবগঠিত প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা ৬,৯৯,০৫১ থেকে বেড়ে ৯,৩৬,৬৫৩ জনে উন্নীত হয়। নতুন প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা খাতে ব্যয় ১১,০৬,৫১০ টাকা থেকে ২২,০৫,৩৩৯ টাকায় এবং শিক্ষার জন্যে স্থানীয় খরচ ৪৭,৮১,৮৩৩ টাকা থেকে ৭৩,০৫,২৬০ টাকায় বর্ধিত হয়। ১৯০৯ সালের মধ্যে প্রদেশে ৮১৯টি নতুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ছাত্রী বাড়ে ২৫,৪৯৩ জন। ১৯১১ সালে নতুন প্রদেশে ৪,৫৫০টি মেয়েদের স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৩১,১৩৯ জন। ১৯০৮-১৯১২ সালে পাঁচ বছরে মক্তবের সংখ্যা ১,২৯৯ থেকে বেড়ে ১,৫৮৪টি এবং মক্তবের ছাত্রসংখ্যা ৪০,১৮৮ থেকে ৫৪,৭০৩ জনে উন্নীত হয়। এ অঞ্চলের মুসলমান ছাত্রদের জন্য বিশেষ বৃত্তি প্রদান এবং বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। বঙ্গভঙ্গের সময় মুসলমান সাব-ইন্সপেক্টরের সংখ্যা ছিল প্রায় শূন্য অথচ ১৯১২ সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৪ জনে। প্রায় প্রতিটি কলেজ ও স্কুলে হোস্টেল বা ছাত্রাবাস স্থাপিত হয়।[৩] স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে শিক্ষা উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং মুসলিম সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখায়। এহেন পরিস্থিতিতে ১৯১২ সালের ২৯ জানুয়ারি ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ তিন দিনের সফরে ঢাকায় আসেন। তাঁর বিদায়ের দিন ৩১ জানুয়ারি নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, এ কে ফজলুল হক প্রমুখসহ ১৯ সদস্যের এক মুসলিম প্রতিনিধিদল গভর্নর জেনারেলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দল লর্ড হার্ডিঞ্জকে একটি মানপত্র দেন, যাতে বড়লাটের প্রশস্তি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য কতিপয় দাবিনামাও ছিল।[৪] প্রতিত্তোরেলর্ড হার্ডিঞ্জবলেন,

> "the Government of India realized that education was the true salvation of the Muhammadans and that the Government of India, as an earnest of their intentions, would recommend to the Secretary of State the constitution of a University at Dacca and appointing an education officer."[৫]

উল্লেখ্য যে, যদিও লর্ড হার্ডিঞ্জ জানুয়ারি ৩১, ১৯১২ এ ঘোষণা দেন তথাপি হিন্দু প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় তা প্রকাশ করা হয়নি।এর একদিন পর ২ ফেব্রুয়ারি একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিষাদ ও হতাশা খানিকটা দূর হয় এবং তারা সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। অন্যদিকে এর বিরোধিতাও শুরু হয় পূর্ববঙ্গ ও কলকাতার হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে। বঙ্গভঙ্গ রদের পটভূমিকায় পূর্ববাংলার ক্ষুব্ধ মুসলমান সমাজকে প্রবোধ দেয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস প্রদান করে।[৬] তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকে পূর্ববঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায় ক্ষতিপূরণ নয়; বরং শিক্ষালাভের সোপান হিসেবে গ্রহণ করে। রাজকীয় সরকারের পত্র ৪ এপ্রিল ১৯১২ মোতাবেক বাংলা সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১৯১২ সালের ২৭ মে রবার্ট নাথানের নেতৃত্বে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে, যা নাথান কমিটি[৭] নামে সমধিক পরিচিত। ন্যাথান কমিটির সুপারিশে উল্লেখ করা হয়, প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে শিক্ষামূলক ও আবাসিক ধরনের এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে শুধু ঢাকা শহরের কলেজগুলো। উক্ত কমিটি ২৫টি স্পেশাল সাব-কমিটির সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রিপোর্ট প্রস্তুত করেন।[৮] নাথান কমিটির রিপোর্ট

ভারত সচিব কর্তৃক ১৯১৩ সালে অনুমোদিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক সংকোচন নীতির কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিলম্ব হয়।

যখন ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বানচাল হতে চলছিল তখন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯১৭ সালে প্রসঙ্গটি ব্রিটিশ ভারতের ইমপেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে উত্থাপন করেন। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলের খসড়া প্রস্তুত রয়েছে এবং যুদ্ধ শেষে তা বাস্তবায়ন করা হবে।[৯] ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গঠিত স্যাডলার কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্কিমটি পরীক্ষা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন শেষ পর্যন্ত ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য সুপারিশ করে। এই কমিশন নাথান কমিটির সুপারিশকৃত ঢাকা শহরের কলেজগুলোর পরিবর্তে বিভিন্ন আবাসিক হলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিটরূপে গণ্য করার সুপারিশ এবং মুসলিম হল, ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করে। প্রসঙ্গত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ঢাকায় প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে ১৩টি সুপারিশ করেছিল কিছু রদবদলসহ তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন রূপে ১৯২০ সালে ভারতীয় আইন সভায় গৃহীত হয় এবং ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ তাতে সম্মতি প্রদান করে। ১ জুলাই ১৯২১ সালে ৩টি অনুষদ, ১২ টি বিভাগ ও ৩টি আবাসিক হল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রথম উপাচার্য ছিলেন পি জে হার্টগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক পরিকল্পনা ও মুসলিম হল প্রতিষ্ঠা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করা হয় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন বিধিবদ্ধ অনেকগুলো কলেজ ছিল, তেমনি প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় আবাসিক ছাত্রাবাস নির্মাণের ওপর। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রাবাস আধুনিক যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ে অসম্ভব ব্যাপার হলেও সেকালের উপমহাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক বাস্তবতায় হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য আলাদা ছাত্রাবাস নির্মাণ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন আবাসিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে 'Residential and other facilities for different communities' বিবেচনা করত: তিনটি হলের সুপারিশ করে এবং তা বাস্তবায়িত হয়। ১৯২১ তিনটি আবাসিক হল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়; মুসলমান ছাত্রদের জন্য মুলিম হল, হিন্দু ছাত্রদের জন্য জগন্নাথ হল এবং সকল ধর্মমতের জন্য ঢাকা হল। পূর্ববাংলার আধুনিক বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস যদি রচনা করতে হয়, তাহলে তার শুরু করতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মুসলিম হলে'র ইতিহাস থেকে। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান আধুনিক ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন একটি ক্রান্তিকালের মানুষ; না আধুনিক, না প্রাচীনপন্থী। ১৯২১ সালে যেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়–মুসলিম হলের জন্ম হয়, সেদিন থেকে পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানদের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে জ্ঞানবিভাসিত যুগের সূচনা হয়। মুসলিম হলের ইতিহাস ছাড়া আধুনিক বাঙালি মুসলমানের বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার ইতিহাস রচিত হতে পারে না।[১০]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র মুসলিম হল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছিল। সে মোতাবেক ১৯২১ সালের ১ জানুয়ারি অমুসলিম ছাত্রদের জন্য জগন্নাথ হল, সকল ধর্মের ছাত্রদের জন্য ঢাকা হল এবং পুরাতন সেক্রেটারিয়েট ভবনের (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ) দু'তলার কয়েকটি কক্ষ নিয়ে অস্থায়ীভাবে মুসলিম হল প্রতিষ্ঠিত হযেছিল।

১৯২১-২২ শিক্ষাবর্ষে মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৮৭ জন এবং অনাবাসিকসহ মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৭৮ জন। ইতিহাস বিভাগের রিডার অধ্যাপক স্যার এ এফ রহমান (পরবর্তীতে প্রথম মুসলিম ও বাঙালি উপাচার্য) মুসলিম হলের প্রভোস্ট নিযুক্ত হন। মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ হাউস টিউটর নিযুক্ত হন, যার দায়িত্ব ছিল মুসলিম ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষা দেখবাল করা। উল্লেখ্য প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের সময় মুসলিম হলে ইসলাম ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। প্রতি রবিবার বিকালে পবিত্র কোরআন শিক্ষার ক্লাশ হতো। মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্রদের জন্য নামাজ ছিল বাধ্যতামূলক। মোটকথা ধর্মভীরু বাঙালি মুসলমান সমাজের ছাত্রদের জন্য মুসলিম হল ছিল আদর্শ আবাস।[১১]

মুসলিম হলের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ও হল কার্যক্রম (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক)

১৯২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে মুসলিম হলে আবাসিক ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১০১ জন এবং মোট ছাত্রসংখ্যা ২২৯ জনে উন্নীত হয়। ১৯২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে আবাসিক ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১২৭; ১৯২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ১৪৮ জন আবাসিকসহ মোট ৩৭১ জন হয়।[১২] ফলে সেক্রেটারিয়েট ভবনের আরো কয়েকটি কক্ষ মুসলিম হলের জন্য বরাদ্দ দিতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে শিক্ষায় পূর্ববঙ্গের অনগ্রসর বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য যে আগ্রহের সূচনা হয় তা ১৯২৫ সাল পর্যন্ত মুসলিম হলের ছাত্র সংখ্যার ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতি তার প্রমান। মুসলিম হলের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রভোস্ট বলেন, "মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্রের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস উপযোগী সকল স্থান হলের জন্য বরাদ্ধ করা হয়েছে। আবাসিক ছাত্রের সংখ্যা আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে তাদের স্থান সংকুলান করা কঠিন হয়ে পড়বে। মুসলমান সম্প্রদায়ের ইচ্ছা যে মুসলিম হলের জন্য একটি স্বতন্ত্র ভবন নির্মাণ করা হোক।"[১৩] এই ক্রমবর্ধমান মুসলিম ছাত্রসংখ্যার উর্ধ্বগতি শুধু একটি সংখ্যা নয়, অধিকন্তু তাহা সমকালীন পূর্ববঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক মর্যাদা, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা ও রাজনৈতিক সচেতনতাবোধকে নির্দেশ করে। মুসলিম হলের ছাত্রসংখ্যার এই ক্রমবর্ধমান ধারা পরবর্তী শিক্ষাবর্ষগুলোতে প্রবাহমান ছিল। ১৯২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬০ জন হলে রমনা হাউস (বর্তমান বংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভবন) মুসলিম হলকে বরাদ্ধ দেয়া হয়। ইতিহাস বিভাগের সহকারী লেকচারার জনাব জহিরুল ইসলামকে রমনা হাউসের সহকারী হাউস টিউটর নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে আবাসিক ২০৮ জনসহ মোট ছাত্রসংখ্যা ৪০৫ জনে উন্নীত হয়।[১৪] ফলে রমনা হাউসেও স্থান সংকুলান না হওয়াতে রমনা হাউসের পরিবর্তে মুসলিম হলের জন্য 'বর্ধমান হাউস' (বর্তমান বাংলা একাডেমী ভবন) বরাদ্ধ প্রদান করা হয়। এ সময় মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ উচ্চ শিক্ষার নিমিত্তে প্যারিস গমন করলে লেকচারার জনাব আবুল হোসেন তাঁর স্থলাভিসিক্ত হন। উল্লেখ্য অনতিকালের মধ্যেই আবুল হোসেনের নেতৃত্বে মুসলিম হলে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'প্রতিষ্ঠা পায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধি ও মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হয় যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

মুসলিম হলে ক্রমবর্ধমান মুসলিম ছাত্র বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। ১৯২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষে আবাসিক ২২৯ জনসহ মোট ছাত্রসংখ্যা ৩৭২ জন এবং ১৯২৮-২৯ শিক্ষাবর্ষে আবাসিক ২৩৪ জনসহ মোট ৩৯৬ জনে উন্নীত হলে মুসলিম হলকে 'চামেরি হাউস' (বর্তমান সিরডাপ ভবন) বরাদ্ধ করা হয়। ১৯২৯-৩০ সালে মুসলিম হলের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪১৮ জন, তন্মধ্যে আবাসিক ২৪২জন। এ বছর জনাব মোমতাজউদ্দীন আহমদ (পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) মুসলিম হলে হাউস

টিউটর হিসেবে যোগদান করেন। তবে ১৯৩০-৩১ শিক্ষাবর্ষে এই হলের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪০১ জন, যার মধ্যে আবাসিক ২১১ জন।[১৫] পূর্বের বছরের তুলনায় কিছুটা কম। শেষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্রমবর্ধমান মুসলিম ছাত্র বৃদ্ধির ফলে মুসলিম হল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনার জন্য বিশেষ করে উপাচার্য হার্টগের উদ্যোগে 'মুসলিম হল কমিটি' গঠন করে। এই কমিটির সদস্য ছিলেন জসন্নাথ হল, ঢাকা হল ও মুসলিম হলের প্রভোস্টগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার এবং হাকিম হাবিবুর রহমান, আনন্দচন্দ্র রায়, সৈয়দ আওলাদ হোসেন প্রমুখ।[১৬] স্থপতি মি. গাইথারকে মুসলিম হল ভবনের পরিকল্পনা ও নক্শা প্রস্তুতের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি কয়েক মাসের মধ্যে পরিকল্পনা ও নক্শা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করেন। ১৯২৮ সালে মুসলিম হল নির্মাণের জন্য বাংলা সরকার দুই লক্ষ টাকা মঞ্জুরী দেয়। এখানে উল্লেখ্য ১৯২৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদের প্রথম আবাসিক হলের নাম ছিল মুসলিম হল। ১৯২৯ সালের ২২ আগস্ট বাংলার গভর্ণর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Chancellor Sir Stanly Jackson ঢাকার প্রয়াত নবাব বাহাদুর স্যার সলিমুল্লাহর নামানুসারে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৩১-৩২ শিক্ষাবর্ষের সূচনালগ্নে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয় এবং Chancellor Jackson ১৯৩১ সালের ১১ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের বর্তমান ভবনটির উদ্বোধন করেন।[১৭]

স্মরণযোগ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নবাব সলিমুল্লাহর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর নামে একটি হলের নামকরণের সর্বসম্মত দাবি ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর এবং বাইরে থেকে। ঢাকার হিন্দু নেতারাও এ প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন দান করে। সরকারও তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। ফলে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধনী) অ্যাক্ট ১৯২৮'- এর মাধ্যমে মুসলিম হলের নামকরণ করে 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল'। এর পরেও অনেকদিন হলটি মুসলিম হল হিসেবেই থেকে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ১৯৩১ সালের ৭ অক্টোবর স্ট্যাটিউড সংশোধনের মাধ্যমে হলের নাম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল' অনুমোদনের জন্য কোর্টের কাছে সুপারিশ করে। বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট ১৯৩২ সালের ১৯ ডিসেম্বর সভায় মুসলিম হলের নাম পরিবর্তন করে 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল' করে। এর পর থেকে 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল'নামের প্রচলন শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর প্রাক্কালেই মুসলিম হল ইউনিয়নের যাত্রা শুরু হয়। ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই গঠিত হয় 'মুসলিম হল ইউনিয়ন সোসাইটি', পরে সোসাইটি শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। মুসলিম হল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা পূর্ববাংলার বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে এক নতুন উদিয়মান সূর্য্য রূপে আবির্ভূত হয়। হল ছাত্র ইউনিয়ন গঠন, হল নেতাদের ভাষায়- একটি বিরাট তরঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়। সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখে হল প্রভোস্টের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে হলের সকল ছাত্রই অংশগ্রহণ করে। ঐ দিন আলাপ আলোচনার পর অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যারা নির্বাচিত হন তাদের মধ্যে আবদুল আজিজ সহ-সভাপতি, মিজানুর রহমান সম্পাদক এবং পাঁচ জন সদস্য- আবদুস সোবহান, সিরাজুল হক চৌধুরী, আবদুল গাফফার, তাহজীব উদ্দিন আহমদ ও মোহাম্মদ আবদুল আজিজ। গঠনতন্ত্র অনুসারে পদাধিকার বলে হলের প্রভোস্ট স্যার এ এফ রহমান ছিলেন হল ইউনিয়নের সভাপতি।

২৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় হল ইউনিয়নের সংসদের অভিষেক, তাতে সভাপতিত্ব করেন হলের প্রভোস্ট ও ইউনিয়নের সভাপতি জনাব রহমান। হলের কমনরুমে রাতের অভিষেক অনুষ্ঠানটি মুসলিম হলের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সাজানো হয়েছিল নানা রঙের ফুল দিয়ে, সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেন ছাত্র-ছাত্রী (লীলা নাগসহ জনা

পাঁচেক এবং নবাব পরিবারের দুজন নবাবজাদি), বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপাচার্য পি জে হার্টগ, শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, উকিল-মোক্তার, নবাব পরিবারের সদস্য; সে এক দীর্ঘ তালিকা। মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ কর্তৃক কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অভিষেক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপাচার্য হার্টগ তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে মুসলিম ছাত্রদের শুধু নিজ সম্প্রদায়ের জন্য নয়, বাংলার সকল সম্প্রদায়ের ও সব মানুষের কল্যাণে অবদান রাখার আহ্বান জানান। এর পর সভাপতির বক্তব্যে স্যার এ এফ রহমান আমন্ত্রিত অতিথিদের এবং উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন বুদ্ধিবৃত্তি চর্চায় মুসলিম হল ইউনিয়ন অনবদ্য ভূমিকা পালন করে যাবে। রাত নয়টায় শুরু হয় আপ্যায়ন। তবে নৈশ ভোজের আয়োজনটি ছিল রাজসিক।[১৮] পরের শিক্ষা বছরগুলোতেও অত্যন্ত আনন্দঘন ও উৎসব মুখর পরিবেশে মুসলিম হল ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত, শুধু ১৯২৬ সালের নির্বাচন ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে পিছিয়ে যায় এবং আমেজে কিছুটা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। নির্বাচনের ধারা ১৯৩০-৩১ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত প্রবাহমান ছিল। কিন্তু ১৯৩১-৩২ শিক্ষাবর্ষ থেকে নির্বাচনের পরিবর্তে সিলেক্ট কমিটির দ্বারা মুসলিম হল ইউনিয়নের কমিটি গঠিত হত। ১৯৩১-৩২ শিক্ষাবর্ষে সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক মুসলিম হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি হয়েছিলেন এম ইউসুফ এবং সম্পাদক আবদুল লতিফ। যথারীতি সভাপতি হয়েছিলেন হলের প্রভোস্ট মাহমুদ হাসান। উল্লেখ্য শুরু থেকেই ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ মনোনিত হতেন হলের হাউস টিউটরদের মধ্য থেকে।

কালের সাক্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল। এই হলেই ১৯২৬ সালের ২১ জানুয়ারি জন্ম নেয় পূর্ববঙ্গের আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। মুহাম্মদ শহিদুল্লার সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সমিতি গঠিত হয়।[১৯] এর প্রাণ পুরুষ ছিলেন আবুল হোসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয় এর কর্মসংসদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এ সংগঠনের সকল কর্মসূচির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা মুসলিম হল স্থাপনের অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাঙালি মুক্তবুদ্ধি চর্চার যে সূর্য্য উদিত হয়, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অচলায়তন থেকে মুক্ত করে মুসলমান সমাজে জাগরণ সৃষ্টি, সমাজ মানস থেকে পশ্চাদপদতা, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্নতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, কুপমন্ডুকতা, অতীতমুখীনতা, অন্ধগোঁড়ামি ও ভেদবুদ্ধি ইত্যাদি অবক্ষয়ী মূল্যবোধের অপছায়া দূর করে বিশ শতকের পুরোভাগে এদেশে মানসমুক্তি ও সমাজ বিকাশের লক্ষে সর্বোপরি মুসলিম সমাজের অচেতন দিকগুলোকে উজ্জীবিত করাই ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের মূল উদ্দেশ্য।[২০] বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ছিলেন মুসলিমসাহিত্য সমাজের খুবই প্রিয়। বস্তুত ঢাকা তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্রোহী কবির মেলবন্ধন তৈরি করেছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজ। সূচনালগ্ন থেকেই কবির সাথে সাহিত্য সমাজের সম্পর্ক বিশেষ মাত্রা পায়। আর সে জন্যই কবি পরপর দুবছর সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন কবি এবং রচনা করেছিলেন 'খোশ আমদেদ' ও 'আসিলে এ ভাঙ্গা ঘরে কে মোর রাঙা অতিথি' গানটি। সাহিত্য সমাজের প্রগতি, চিন্তা-চেতনা, কর্মকান্ড ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ছিল সমকালীন প্রাচীন পন্থীদের দ্বারা সমালোচনায় মুখর। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে রক্ষণশীল সমাজ। বিদ্রোহী কবির অভিভাষণে বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠে এভাবে–

> ''বহুকাল পরে কাল রাতে আমার ঘুম হয়েছে। (---) একদিন মনে করতাম আমি একাই কাফের। আনোয়রুল, কাদির (মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্মসংসদ সদস্য) প্রমুখ কতগুলি গুণী ব্যক্তি দেখছি আস্ত কাফের। আমাদের দল বড় হয়েছে এর চেয়ে বড় সান্তনা আমি চাই না।''[২১]

দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে এসে কবি রচনা করলেন তাঁর সেই বিখ্যাত গানটি 'চল চল চল'এবং সম্মেলনে তা পরিবেশনা করেন। উল্লেখ্য আমন্ত্রণ ছাড়াও বিদ্রোহী কবি অনেকবার মুসলিম হলে এসেছেন। মুসলিম হলের ডাইনিং রুমে তাঁকে নিয়ে ছাত্ররা বৈঠক করেছেন। কবি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন, গান গেয়েছেন। তিনি ছিলেন বাংলার তারুণ্যের প্রতীক। মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপাত্র হিসেবে ১৯২৭ সালের ১৭ এপ্রিল (চৈত্র ১৩৩৩), ঢাকা থেকে 'শিখা' প্রকাশিত হয়।[২২] সমস্যাগ্রস্থ সমকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজকে মুক্ত বুদ্ধি চর্চার মাধ্যমে সামনে এগিয়ে নেয়ার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় শিখায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে। শিখার আপ্ত বাক্য ছিল- 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ঠ মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। এ চেতসায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন মুসলিম সাহিত্য সমাজের সদস্যগণ।

উল্লেখ্য মুসলিম সাহিত্য সমাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা মুসলিম হলে ১৯২৭-১৯৩৬ এই দশ বছরে মোট দশটি বার্ষিক সম্মেলন করেছিল। দশম বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম হলের মুসলিম সাহিত্য সমাজ তার যাত্রা শুরু করেছিল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের অভিনন্দন নিয়ে আর শেষ করেছিল শরৎচন্দ্রের অভিনন্দন দিয়ে। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত মুসলিম সাহিত্য সমাজ তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল তা কেবল মুসলিম হলের ছাত্র ও শিক্ষকদের উৎসাহের জন্যই। তবে অধ্যাপক আবুল হোসেনের সাহিত্য সমাজ ত্যাগের পর সমাজের আগের ধার আর ছিল না। মুসলিম সাহিত্য সমাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা মুসলিম হলের কোন সংগঠন ছিল না বটে, তবে নিশ্চিতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলিম হলের ছাত্র-শিক্ষকদের পৃষ্টপোষকতা লাভ করেছিল।

১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঢাকা আগমন করেন এবং কার্জন হলে ১০ ফেব্রুয়ারি *'The Meaning of Arts'*এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি *'The Big and the Complex'*বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। শিল্পকলা বা নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে কবি তাঁর মৌলিক চিন্তা প্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি আবাসিক হল- ঢাকা হল, জগন্নাথ হল এবং মুসলিম হলের পক্ষ থেকে কবি গুরুকে সংবর্ধনা জানানোর আয়োজন করা হয়। কিন্তু অসুস্থতার কারণে কবি শুধুমাত্র মুসলিম হলের সংবর্ধনা সভায় যোগদান করতে পেরেছিলেন। সে আয়োজন ছিল এক এলাহী কাণ্ড; হল ঘরে প্রবেশের পথ থেকেই কবির ওপর শুরু হয় পুষ্পবৃষ্টি। ফুলেল মঞ্চ তৈরী হয়েছিল বিশেষ কায়দয়। মুসলিম হলের সংবর্ধনা সভায় কবিগুরুকে প্রদত্ত মানপত্রে বলা হয়েছিল- "বিধাতা বড় দয়া করিয়া প্রাণহীন ভারতের দুর্দিনে তোমার মত বিরাট প্রাণ মহাপুরুষকে দান করিয়াছেন। তোমার প্রাণ মুক্ত, বিশ্বময়। সেখানে হিন্দু নাই, মুসলমান নাই, খ্রিষ্টান নাই আছে মানুষ। তজ্জন্য আমরা তোমার স্নেহ ও আশীর্বাদের অধিকারী হইয়া তোমার অমূল্য সময়ের কিঞ্চিৎ দাবি করিতে সাহসী হইয়াছি। জানি, তোমার প্রেম-প্রবণ কবি-হৃদয়ে আমাদের এই দাবি কত মধুর হইয়া বাজিয়াছে।" মান পত্রটি রচনা করিয়াছিলেন মুসলিম হলের অন্যতম হাউস টিউটর অধ্যাপক আবুল হোসেন।[২৩]

রবীন্দ্রনাথ মুসলিম হলের সংবর্ধনা ও মানপত্রের উত্তরে বলেছিলেন, "এই সভাস্থলে প্রবেশ করার পর হতে এ পর্যন্ত আমার উপর পুষ্প বৃষ্টি হচ্ছে। প্রাচীন শাস্ত্রে পড়েছি কৃতি ব্যক্তির উপর পুষ্প বৃষ্টি হয়। এ পুষ্প বৃষ্টি যদি তা-ই প্রমাণ করে, তবে আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত।" মুসলিম হলের সংবর্ধনা কবিকে অভিভূত করেছিল।[২৪] রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হিসেবে তাঁর সাথে আগমন করেন বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লিম, তিনি তখন শান্তিনিকেতনে চীনা ভাষার শিক্ষক ছিলেন। মুসলিম হলের ছাত্ররা তাঁকেও হলে আমন্ত্রণ জানায়। বিদ্রোহী কবির কথা আগেই বলা

হয়েছে। ১৯২৭ সালে নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভায় যোগ দিতে ঢাকায় আগমন করেন। তখন মুসলিম হলের ছাত্ররা তাঁকে হলে আমন্ত্রণ জানায়। উদার, অসাম্প্রদায়িক ও বাস্তববাদী নেতাজী আমন্ত্রণ গ্রহণ করে মুসলিম হলে আসেন এবং উপস্থিত কয়েকশ হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় জাতির কল্যাণের জন্য ভেদাভেদ ভুলে সকল সম্প্রদায়ের ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছিলেন।[২৫]

মুসলিম হলে সাহিত্য চর্চার ধারা শুরু করেছিলেন হলের ধর্মীয় শিক্ষার দায়িত্ব পালনকারী হাউস টিউটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর সম্পাদনায় '*Peace*'নামক মাসিক ম্যাগাজিন বের হয়, এতে মুসলিম সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্পর্কিত মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশনার নজীর পাওয়া যায়। এছাড়া ১৯২৬ সালে কবিগুরুর মুসলিম হলে আগমন ও তাঁর অনুপ্রেরণা সাহিত্যপ্রেমী ছাত্রদের মধ্যে বিপুল আগ্রহ জন্মায়। তাদের তৎপরতায় ১৯২৭ সালের মার্চে মুদ্রিতভাবে আত্মপ্রকাশ করে 'মুসলিম হল ম্যাগাজিন'। সাময়িকীটি ছিল একই সঙ্গে ইংরেজী ও বাংলায়। সম্পাদক ছিলেন হল ইউনিয়নের সাহিত্য সম্পাদক এ এস খান।[২৬]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলের প্রথম প্রভোস্ট ছিলেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এ এফ রহমান, যিনি পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দেশীয় উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর মতো উদারচেতা অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্যের প্রভাবে মুসলিম ছাত্রদের মনে সাম্প্রদায়িক চিন্তা প্রবেশ করতে পারেনি। তাঁর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের সূত্রপাত ঘটে। তিনি ছিলেন মুসলিম হলের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রধান পৃষ্টপোষক। মুসলিম হলের সূচনা পর্বেই হলের কতিপয় ছাত্র শারদীয় ছুটির পূর্বে হলের ডাইনিং রুমে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বঙ্গনারী' নাটকটি মঞ্চস্থ করার জন্য মহড়া শুরু করে। কিন্তু বাদ সাধে ইসলামিক স্টাডিজ, আরবী ও ফার্সির ছাত্ররা। তাদের বিরোধিতার পক্ষে যুক্তি হলো– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সূতরাং সেখানে মুসলিম হলের নামে মুসলমান ছাত্রদের অভিনয় হতে পারে না। থিয়েটার বিরোধী মওলানা আবু নসর ওহীদ, মওলানা মুনাওর আলী ও মওলানা নাজির হোসেন ফতোয়া দিলেন- "যে ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর বেশ নিয়ে নারীর মতো অভিনয় করে, সে ক্ষেত্রে অভিনয় বিলকুল না-জায়েজ।"অধ্যাপক রহমান এই থিয়েটার বিরোধিতায় অবাক হন এবং তাদের বোঝাতে চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। পুজার ছুটির সময় থিয়েটার বিরোধী ছাত্ররা বাড়ি চলে যায় এবং সেই সুযোগে ছুটির মধ্যে থিয়েটার পার্টির ছেলেরা যথারীতি ডাইনিং হলে তাদের নাটক মঞ্চস্থ করে। গোপনে প্রভোস্টকে ডিনারে আপ্যায়িত করা হয়।[২৭]

মুসলিম হলে থিয়েটারকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের মধ্যে দুটি ধারা লক্ষ করা যায়। একটি রক্ষণশীল অপরটি প্রগতিশীল এবং এই বিভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠে পরের হল ইউনিয়নের নির্বাচনে; রক্ষণশীল গ্রুপ সবকটি পদে জয়লাভ করে। কিন্তু তাতে করে এই সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বন্ধ হয়নি। দেশ বিভাগ কাল পর্যন্ত সব হলে বার্ষিক নাটক অনুষ্ঠিত হত এবং নারী চরিত্রে ছেলেরাই মেয়ে সেজে অভিনয় করত। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সলিমুল্লাহ হল ইউনিয়ন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বন্ধু' নাটক মঞ্চস্থ করে, এ নাটকেই মেয়েরা নারী চরিত্রে সহঅভিনয় করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তখন হলের প্রভোস্ট ছিলের ড. এম ও গনি, তিনি হলে সহঅভিনয়ের অনুমুতি জ্ঞাপন করেন। মুসলিম হলের বার্ষিক নৈশ ভোজ ছিল একটি অসাধারণ অনুষ্ঠান, যার জন্য ছাত্ররা সারাবছর বিশেষ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করত। প্রতিবছর শারদীয় দুর্গাপুজার ছুটির দু'-এক দিন আগে এই নৈশ ভোজের আয়োজন হতো। শুধু ঢাকা শহর নয়, শুধু বাংলার নয়, উপ-মহাদেশের বিশিষ্ট

মুসলিম ব্যক্তিদের হলের বার্ষিক ভোজে আমন্ত্রণ জানানো হতো। উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসা ও তাদের কাছ থেকে জানা।

এ ছাড়া মুসলিম হলের বার্ষিক মিলাদ মাহফিল ছিল একটি উল্লেখযোগ্য উপলক্ষ। বর্তমানে ঈদে মিলাদুন্নবী বা কুলখানী-চেহলাম ইত্যাদিতে যে ধরণের মিলাদের আয়োজন দেখা যায়, তার সঙ্গে সেই মিলাদ মাহফিলের কোন মিল ছিলনা। সে মিলাদ যতটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল, ততটাই বা তার চেয়ে বেশী ছিল সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বার্ষিক ভোজ ও মিলাদ মাহফিলে মুসলিম ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের ছাত্র-শিক্ষক যোগদান করতেন।[২৮] হল বিতর্ক প্রতিযোগিতা ছিল মুসলিম হলের এক অন্যতম সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। এছাড়াও ছিল বার্ষিক বক্তৃতা। ছাত্ররা বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষাতেই বিতর্ক করতেন। প্রতিদিন সন্ধায় নানা রকম ইনডোর খেলা হতো। হলের Social Service League সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে। প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা দিতে এবং সেবা কাজে এই হলের ছাত্ররা দরিদ্র মহল্লায় গমন করতেন। সাহিত্য বিভাগ ছিল সবচেয়ে সক্রিয়। বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই হলের ছাত্ররা সাহিত্য চর্চা করতেন। উর্দু সাহিত্য চর্চার একটি আলাদা বিভাগ ছিল। হলের উৎসাহী ছাত্রদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল 'Excellsion Club'। উদ্যোগীদের মধ্যে ছিলেন- আলতাফ হোসেন, আতাউর রহমান খান, কাজী আনওয়ার-উল-হক, এ ডব্লিউ মাহমুদ প্রমুখ। এই হলের বর্ধিত অংশ বর্ধমান হাউসে ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে হল ইউনিয়নের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় আল মামুন ক্লাব। আব্বাসীয় খলিফা আল মামুনের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্লাবটি। এই ক্লাবের কাজ ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা।[২৯]

১৯২১ সালের শুরুতেই হলের ডাইনিং কক্ষে ব্যতিক্রমী এক বিরাটাকার টেবিল তৈরি করা হয়। সেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একসাথে বসে খাবার অধিকার ছিল। অন্য হলের অমুসলিম ছাত্ররাও এটেবিলে বসতে ও খেতে পারতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য দুটি হলে এ ধরণের অসাম্প্রদায়িক চেতনা লক্ষ করা যায়নি। মুসলিম হলের কমন টেবিলকে কেন্দ্র করেই বাঙালি মুসলমানদের অধুনিকতার সূচনা হয়েছিল। সমাজ, রাজনীতি ও শিল্প-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হতো এই টেবিলে। টেবিলটিতে বসেছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, লর্ড লিটন, স্যার আবদুর রহিম সহ অনেকে।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

১৯২১-৪৭ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্ম-তৎপরতায় মুসলিম হলের তুলনায় অন্যদুটি হল ছিল অগ্রগামী। তবে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতির সূতিকাগার হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাজনীতিচর্চা কলিকাতা কেন্দ্রিক ছিল। যদিও ১৯০৬ সালে পূর্ববঙ্গে মুসলিমলীগ গঠিত হয়, তা ছিল উচ্চবর্গীয় রাজনৈকিত প্রতিষ্ঠান। গণমানুষের সংগঠনে পরিণত হতে পারে নাই বিধায় ঢাকায় রাজনীতি চর্চার সুযোগ ছিল সীমিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ববঙ্গের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশধারার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিরও বিকাশ শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে পূর্ববঙ্গের রাজনীতির কেন্দ্র হিসেবে পরিচয় লাভ করবে তার আভাস পাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও বাংলার গভর্ণর আলেকজান্ডার লিটনের বক্তৃতায়। তিনি বলেন,

> "That in my opinion this university is Dacca's greatest possession, and will do more than anything else to increase any spread the fame of Dhaka beyond the limit of Bengal or even if India itself. Most of you I hope, have

> political ambition and whether or not you ever become active politicians, you are probably anxious to see the development of the political consciousness of your country. A community consciousness is the first essential of nationhood, and here in a university like this that community consciousness can be and should be developed. Try and conceive of Dhaka University as an alma mater in whose service the Muhamedan and the Hindu can find a common bond of unity, and whose credit and reputation shall stand to you for something greater than personal ambition or worldly advancement. If you can learn this while you are students, you will have qualified yourself for the service of a still greater mother thereafter."[30]

লর্ড লিটনের ঐ আবেদন ইংরেজ আমলে স্বল্প মাত্রায় এবং পাকিস্তান আমলে যে সার্বিক কার্যকর হয়েছিল তার উদাহরণ চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ভাষা আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধিনতা সংগ্রাম বিশেষত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকসমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা অবিস্মরণীয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ন্যায় রাজনীতি চর্চার কেন্দ্রও ছিল হল কেন্দ্রিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির ১৯২১-৪৭ কাল পর্বে উপমহাদেশের, বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলায় যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত হয় তন্মধ্যে বিশ শতকের শুরু থেকে তিরিশের দশক পর্যন্ত স্বদেশী বিপ্লবী ও অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, বুদ্ধিরমুক্তি আন্দোলন, চল্লিশের দশকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রগতিশীল সংগ্রাম, ভারত ছাড় আন্দোলন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল আন্দোলন-সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলের ছাত্রদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা ছিল। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে প্রতিষ্ঠিত তিনটি আবাসিক হলের মধ্যে ঢাকা হলে 'অনুশীলন সমিতির'এবং জগন্নাথ হলে 'যুগান্তর পার্টির' নেতা-কর্মীদের আধিক্য ছিল।[৩১]

অবিভক্ত বাংলায় প্রকাশ্য স্বদেশী আন্দোলনের সাথে মুসলিম হলের ছাত্রদের প্রায় নিয়মিত যোগাযোগ থাকলেও বাস্তব কারণেই গোপন সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে তাদের সংযোগ ছিল কদাচিৎ। এ জন্য তাদেরকে এককভাবে দায়ী করা যায় না। কারণ, বিপ্লবী সংগঠনগুলো সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিল। ফলে মুসলিম হলের ছাত্রদের ঐ সকল সংগঠনে জড়িত হওয়া সম্ভব ছিল না। ১৯৩৪ সালে একটি গোপন সম্মেলনের মাধ্যমে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নতুন করে গঠিত হয়। ১৯৩৮ সালের দিকে মুসলিম হলের কতিপয় ছাত্র সরাসরি এ পার্টির পতাকাতলে সমবেত হয় এবং ছাত্র আন্দোলনে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য ১৯৩৮ সালে 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠিত হয় এবং ঐ সালের শেষভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম ছাত্ররা সমবেতভাবে এক সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা ও তার আশে পাশে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয় যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেও প্রভাবিত করে। ১৯৪১ সালের দাঙ্গা ১৯৪৬ সালে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বিশেষ করে ১৬ আগস্ট রাতে কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গার খবর রেডিও মারফত ঢাকায় পৌঁছালে তিক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঢাকাবাসী আতঙ্কিত হয়ে উঠে। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মিরা ঐ রাতেই শান্তি রক্ষার আবেদন জানিয়ে অবিরাম প্রচার শুরু করে। মুসলিম হলের কতিপয় প্রগতিশীল ছাত্রনেতা সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখতে তাদের সাথে সহযোগিতা করেন। তাদের মধ্যে শামসুল হক, শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ তোহা এবং তাজ উদ্দিন আহমদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩২]

১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে ঢাকার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল না। এহেন অবস্থায় ঢাকার কমিউনিস্টরা ফেব্রুয়ারি মাসে রশিদ আলী দিবসের প্রথম বার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল কমরেডদের উদ্যোগে এ উপলক্ষে যখন প্রভাতফেরী বের হয়, তখন বিভিন্ন আবাসিক হল থেকে দলে দলে ছাত্ররা এসে এতে যোগ দেয়। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, জগন্নাথ হল, ঢাকা হল ও ফজলুল হক হল থেকে শতকরা ৯০ ভাগ ছাত্রই এতে অংশ নেয়। শেষ পর্যন্ত ১৪৪ ধারার মধ্যেও ১০ হাজার লোকের সমাগম ঘটে। শোভাযাত্রা যাবার সময় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শহরবাসী সানন্দে তাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। তারা একে অপরকে আলিঙ্গন করে। উক্ত মিছিলের মূল শ্লোগান ছিল 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই' এবং 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। এর ফলে একদিনের মধ্যে ঢাকা শহরের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রূপ ধারণ করে।[৩৩] এহেন পটভূমিকায় ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শংকর রায় প্রমুখ বিশিষ্ট উদারপন্থী রাজনৈকিত নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের দ্বি-জাতী তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ করার বিরোধিতা করে অন্তত বাংলাকে অসাম্প্রদায়িক ধারায় অখণ্ড রাখার পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে ব্রতী হন। কিন্তু সুচতুর ব্রিটিশ শাসকবর্গ এর আগেই ভারতের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাথে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব চূড়ান্ত করে ফেলে।

গবেষণার গুরুত্ব ও ফলাফল

ইতিহাসের উদ্দেশ্যই হচ্ছে অজানা বিষয়ের অবতারণা করা এবং সত্য উদঘাটন করে তা প্রকাশ করা। কেননা, ইতিহাস অনুসন্ধান অতীতের সাথে বর্তমানের মেলবন্ধন রচনা করে এবং ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা প্রদান করে।সূতরাং আলোচ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস লিখনে নতুন মাত্রা যোগ করবে এবং এ সংক্রান্ত ইতিহাস পরবর্তী গবেষণায় সহায়ক হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সাথে মুসলিম হলের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হলেও মুসলিম হলের ইতিহাস নিয়ে তেমন কোন গবেষণাধর্মী কার্যক্রম হয়নি। আলোচ্য গবেষণামুলক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস রচনায় নতুন দিক উন্মোচিত হবে এবং বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে।

উপসংহার

মুসলিম হলকে পূর্ববাংলার গৌরব বলে আখ্যায়িত করা হতো। তাইতো সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ বলেছেন, "বাস্তবিক এককালে পশ্চিম ভারতের জন্য আলীগড় যা ছিল, পূর্ব ভারতের জন্য মুছলিম হল তাই। মুছলিম ভারতের পুনঃসংগঠনে মুছলিম হলের স্থান অবিসংবাদিত।"[৩৪] শুরুতে সংখ্যায় স্বল্প হলেও কালক্রমে মুসলিম হলের ছাত্ররা পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের প্রগতিশীল অংশে পরিণত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের দুটি প্রধান অন্তরায় অর্থনেতিক দুরবস্থা এবং ধর্মীয় গোড়ামি অতিক্রম করার প্রয়াস পায়। এই হল তথা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ক্রমান্বয়ে পূর্ব বাংলায় একটি শিক্ষিত শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। শুরুতে এ শ্রেণীটি আকারে ছোট হলেও কালক্রমে এরাই বাংলার মুসলিম সমাজের প্রগতিশীল অংশে পরিণত হয়। আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ, চাকুরি লাভ, সাংবাদিকতা, আইন পেশাসহ নানাবিধ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করার

মধ্যদিয়ে এই হলের ছাত্রদের দ্বারা পূর্ব বঙ্গের মুসলিম সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ, পদস্থ চাকুরি লাভ, নানাবিধ পেশাভিত্তিক শ্রেণীর অর্ন্তভূক্তি এবং নানা রকম আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করে নতুন এই শ্রেণীটি সমাজ থেকে অন্ধকার দূর করে প্রগতির আলো প্রজ্জ্বলন করে। ১৯২১-১৯৪৭ সময়কালের বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিই পরবর্তীতে ১৯৪৭-১৯৭১ বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদান করে বাঙালি জাতির কাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal (1884-1912),* (Dhaka: Oxford University Press, 1974), p. 245

২ India. Governor-General (1910-1916: Hardinge), *The historical record of the imperial visit to India*, Pub. for the government of India by J. Murray, 1914, p. 174

৩ Sufia Ahmed, *op.cit,* pp.288-295; রফিকুল ইসলাম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছর*, (ঢাকা: অনন্যা, ২০১২), পৃ. ১১-১২

৪ *ঢাকা প্রকাশ,* ১৪ জানুয়ারি ১৯১২, পৃ. ৩

৫ *Calcutta University Commission Report,* Vol. IV, p. 122

৬ M.A. Rahim, *The History of the University of Dacca,* (Dhaka: published by University of Dacca, 1981) p. 1

৭ নাথান কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- বাংলার জনশিক্ষা পরিচালক জি ডব্লিউ কালচার, আইনজীবী রাসবিহারী ঘোষ, নবাব সৈয়দ সওয়াব আলী চৌধুরী, নবাব সিরাজুল ইসলাম, ঢাকার আইনজীবী আনন্দচন্দ্র রায়, মুসলিম বুদ্ধিজীবী মুহম্মদ আলী, এইচ আর জেমন, এ জে আর্চবোল্ড, ললিত মোহন চ্যাটার্জি, সি ডব্লিউ পিকে এবং শামসুল ওলামা আবু নসর ওয়াহেদ। সদস্যসচিব ছিলেন ডি ফ্রেজার। কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন রবার্ট নাথান।

৮ M.A. Rahim, *op, cit,* p. 8

৯ *Ibid,* p. 10

১০ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা*, (ঢাকা: প্রথমা, ২০১৬), পৃ. ১৯

১১ রফিকুল ইসলাম, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছর*, (ঢাকা: অনন্যা, ২০১২), পৃ. ৫৮

১২ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী আর্কাইব) *মুসলিম হল বার্ষিক রিপোর্ট* ১৯২৩, ১৯২৪ ও ১৯২৫

১৩ *মুসলিম হল বার্ষিক রিপোর্ট* ১৯২৫

১৪ *মুসলিম হল বার্ষিক রিপোর্ট* ১৯২৬, ১৯২৭

১৫ *মুসলিম হল বার্ষিক রিপোর্ট* ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩০ ও ১৯৩১

১৬ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪

১৭ রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১

১৮ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০-১২

[১৯] খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ ঃ সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ১১২

[২০] কাজী মোতাহার হোসেন, *স্মৃতিকথা*, (ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ. ৬৬

[২১] সরোয়ার হোসেন, *জীবনী গ্রন্থমালা*-৭, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী), পৃ. ৩৪

[২২] এটি একটি বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা। প্রথম সম্পাদক ছিলেন আবুল হোসেন, তারপর মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ও সর্বশেষ আবুল ফজল। ১৯৩১ সালে ৫ম বর্ষ প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

[২৩] রফিকুল ইসলাম,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

[২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

[২৫] সৈয়দ আবুল মকসুদ,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮

[২৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭

[২৭] মুহাম্মদ আবদুর রহিম, ইতিহাসের ধারায় এস এম হল, *স্মৃতিময় এস এম হল স্মরণিকা ২০০৩*, পৃ. ৪৩২-৩৩

[২৮] সৈয়দ আবুল মকসুদ,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২

[২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১

[৩০] Convocation speech of Governor of Bengal and Chancellor of Dhaka University Lord Lytton, 22 February, 1923 (Cited from Shah M. Farouk, 'The Universities of Bangladesh', in *Universities of Commonwealth Countries*. London, 1996, p. 265.)

[৩১] রংগলাল সেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছর: মধুদার বাবা আদিত্যের আমল, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান*, (ঢাকা: ইউপিএল, ২০০৯), পৃ. ১০৪

[৩২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫

[৩৩] জ্ঞান চক্রবর্তী, *ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৭২), পৃ. ১২৫

[৩৪] ইব্রাহীম খাঁ, মুসলিম হল, *বাতায়ন*, (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ), পৃ. ৩৪